বৈশ্বিক সংকট ও সভ্যতার বিপর্যয় হতে মানবমুক্তির গতিপথ: প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের বলাকা

onusurjonabeel

নাবীল অনুসূর্য

Link - https://www.google.com/amp/s/nabeelonusurjoblog.wordpress.com/

বলাকা রবীন্দ্রনাথের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ। কেবল ছন্দের অভিনবত্ব বা ভাষার পরিণতিই নয়, এ কাব্যে এসে কবির ভাবেরও এক ধরনের পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটেছে; এবং সে পূর্ণতার প্রেক্ষাপট কেবল বাংলা নয়, সমগ্র বিশ্ব; কেবল বাঙালি নয়, সমগ্র মানবজাতি। বিশেষত তৎকালিন যুদ্ধোন্মুখ বিশ্ববাস্তবতার বিপরীতে কবির অবস্থান এবং সেই বাস্তবতা থেকে সামগ্রিক মানবের মুক্তির গতিপথের সন্ধান-প্রচেষ্টা এই কাব্যে বেশ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত। বর্তমান নিবন্ধটিতে মূলত বলাকা কাব্যে কবির সেই অবস্থানের দ্যোতক কয়েকটি কবিতার নিরিখে কবির সেই সমকালিন বৈশ্বিক সংকট ও সভ্যতার বিপর্যয় থেকে মানবমুক্তির গতিপথের স্বরূপ সন্ধান ও তার কাব্যিক রূপায়ণ চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হবে। এই কবিতাগুলোর মধ্যে পড়বে কাব্যটির ১-৫ সংখ্যক এবং ৩৭ ও ৪৫ সংখ্যক কবিতা।

রবীন্দ্র-কবিমানস ও বলাকা রচনার সময়ে কবিমানসের প্রকৃতি

বলাকা কাব্যের উদ্দিষ্ট কবিতাগুলোর আলোকে বৈশ্বিক সংকট ও সভ্যতার বিপর্যয়ে রবীন্দ্রনাথ নির্মিত মানবমুক্তির গতিপথের স্বরূপ ও কাব্যিক রূপায়ণ ব্যাখ্যা করার পূর্বে, অত্যন্ত সংক্ষেপে হলেও, রবীন্দ্র-কবিমানস ও বলাকা রচনার সময়কার কবিমানসের প্রকৃতি আলোচনা করা জরুরি। আলোচনার সুবিধার্থেই অতি সংক্ষেপে রবীন্দ্র-কবিমানসের মৌলিক প্রবণতা ও গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদলগুলো পূর্বেই কিছুটা আলোচনা করা গেল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বতোভাবেই ছিলেন একজন মানবমুখিন কবি; তাঁর কবিমানস প্রায় সর্বদাই ছিল মানবমুখিন। প্রমথনাথ বিশীর ভাষায়, ‘রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভার প্রধান ধর্ম ইহার মানবমুখিতা; কালিদাসের পর এত বিরাট মানবমুখী কবিপ্রতিভা আমাদের দেশে জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ।’ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ নিজে কালিদাসের গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। অবশ্য, প্রমথনাথ বিশী তার কবিপ্রতিভার আরো দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন- মানবমুখী হলেও ‘মানবের অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিতে’ না পারা, এবং প্রকৃতির তার কবিতায় মানুষের বিকল্প হয়ে দাঁড়ানো; ‘ওয়ার্ডসওআর্থ প্রকৃতির মধ্য দিয়া জগৎসত্তাকে জানিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্য দিয়া মানবসত্তাকে জানিয়াছেন; প্রকৃতি-প্রীতির মধ্যে তিনি মানব-প্রীতির স্বাদ পাইয়াছেন।’

উপরে উল্লিখিত তাঁর কবিমানসের এই মানবমুখিনতা প্রায় সর্বদাই থাকলেও তার রূপ বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাণের স্বাভাবিক নিয়মেই সতত প্রবাহিত নদীর মতো তার রূপান্তর ঘটেছে। এমনকি, কখনো কখনো এই মানবমুখিনতাকে ছাপিয়ে গিয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে জাতীয়তাবাদী চিন্তা কিংবা উপনিষদ-ভগ্বতের প্রভাব। তখন তিনি জাতীয়তাবাদী চিন্তা থেকে প্রাচীন সাহিত্যের কাহিনি ও চরিত্রের নবরূপায়ণ করতে থাকেন, কিংবা উপনিষদ-ভগ্বদের প্রভাবে এক আধ্যাত্মিক মরমিয়া জগতে ডুব দেন; তার কবিতাগুলি হয়ে ওঠে বৈষ্ণব পদাবলীর আধুনিক রূপায়ণ। মানবের চেয়ে মুখ্য হয়ে ওঠে অরূপ স্বত্ত্বা। কিন্তু পরবর্তীতে আবার রবীন্দ্রনাথের কবিমানস ফিরে আসে মানুষের কাছে, আরো প্রবলভাবে, আরো পূর্ণাঙ্গভাবে।

রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের এই বিভিন্ন রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে পূর্ণতার পথে যাত্রাকে ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, বিশেষ প্রবণতা ও বিকাশের পর্যায় অনুসারে, Unity in Diversity-র সূত্র মেনে ৮টি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। নিচে সংক্ষেপে এই ৮টি পর্যায়ের বর্ণনা দেওয়া হল-

অপ্রকাশের কাল

উল্লেখযোগ্য কাব্য: বনফুল- কড়ি ও কোমল

কবিমানসের বৈশিষ্ট্য: কবি-প্রতিভা অবিকশিত

প্রতিভার উন্মেষ

উল্লেখযোগ্য কাব্য: মানসী, সোনার তরী

কবিমানসের বৈশিষ্ট্য: নিসর্গপ্রেম ও অহেতুক বিশ্বাত্ববোধের ব্যাকুলতা

প্রতিভার বিকাশ : প্রথম পর্যায়

উল্লেখযোগ্য কাব্য: চিত্রা

কবিমানসের বৈশিষ্ট্য: সৌন্দর্যতত্ত্ব; পৃথিবী-প্রীতি ও বাস্তব মানুষ-প্রীতি; জীবনদেবতা বা স্বকীয় গতিশীল ব্যক্তিস্বত্ত্বার কল্পনা

প্রতিভার বিকাশ : দ্বিতীয় পর্যায়

উল্লেখযোগ্য কাব্য: চৈতালি- নৈবেদ্য

কবিমানসের বৈশিষ্ট্য: প্রাচীন সাহিত্য ও জাতীয়তা বিষয়ে অনুরাগ

প্রতিভার বিকাশ : তৃতীয় পর্যায়

উল্লেখযোগ্য কাব্য: নৈবেদ্য- শারদোৎসব

কবিমানসের বৈশিষ্ট্য: অরূপ অনুভবের আরম্ভ

প্রতিভার বিকাশ : চতুর্থ পর্যায়

উল্লেখযোগ্য কাব্য: গীতাঞ্জলি- গীতালি

কবিমানসের বৈশিষ্ট্য: অরূপ অনুভবের পূর্ণতা

প্রতিভার পরিণাম

উল্লেখযোগ্য কাব্য: বলাকা- ফাল্গুনী- পূরবী- মহুয়া- মুক্তধারা- রক্তকরবী

কবিমানসের বৈশিষ্ট্য: জীবনদেবতা ও অরূপের সমন্বয়

গোধূলি পর্যায়

উল্লেখযোগ্য কাব্য: পরিশেষ- তাসের দেশ- কালের যাত্রা- পুনশ্চ- ‘শেষ লেখা’

কবিমানসের বৈশিষ্ট্য: গদ্যছন্দের চর্চা

আমাদের আলোচনায় থাকছে যে পর্যায়টি, ক্ষুদিরাম দাস সে পর্যায়ের নামকরণ করেছেন- প্রতিভার পরিণাম। এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যগুলোর কিছুটা আভাস পাওয়া যায় ‘গীতালি’ কাব্যের শেষদিকের কয়েকটি কবিতায়। এ পর্যায়ের প্রথম কাব্যটিই বলাকা; সম্ভবত, একই সাথে শ্রেষ্ঠ কাব্যও। এই পর্যায়কে প্রতিভার পরিণাম বলা হয়েছে, কারণ রবীন্দ্র-কবিমানস পূর্বে যে জীবনদেবতা আর অরূপের সাধনা করে আসছিল, এই পর্যায়ে এসেই তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হয়। শুধু যে সমন্বয়ই সাধিত হয়েছে, তাই-ই নয়, জীবনদেবতা আর অরূপের প্রকৃতিও যেন আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আবার প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্র-কবিমানসের রূপান্তরকে ৪টি পর্বে ভাগ করেছেন- সন্ধ্যাসংগীত পর্ব, সোনার তরী পর্ব, খেয়া পর্ব আর বলাকা পর্ব। সন্ধ্যাসংগীতের পূর্বের কাব্যগুলোকে তিনি বিবেচনা করেননি, কারণ তখনো রবীন্দ্রনাথ ঠিক যেন গীতিকবিতার সুরটি ধরতে পারেননি বলে তার ধারণা। আবার, তিনি যখন এই পর্ব-বিভাজন করেন, রবীন্দ্রনাথ তখনো বিপুল উদ্যমে লিখে যাচ্ছেন। ফলে, তাঁর শেষদিকের কাব্যগুলো এই পর্ব-বিভাজন থেকে বাদ পরে গেছে। নিচে প্রমথনাথ বিশী-কৃত রবীন্দ্র কবিমানসের এই ৪টি পর্বের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল-

সন্ধ্যাসংগীত পর্ব

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যের বাহন ঠিক চিনে উঠতে পারছেন না; তাই ‘সন্ধ্যাসংগীত আর ‘প্রভাতসংগীতে’র কবিতাগুলি সংগীতাশ্রয়ী, আবার ‘ছবি ও গান’ আর ‘কড়ি ও কোমলে’র কবিতাগুলি চিত্রাত্মক; ‘মানসী’তে আবার এই দুইয়ের মিলনের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়; গীতিকবিতার গতি আয়ত্ত্ব

সোনার তরী পর্ব

‘সোনার তরী’তে এসে সংগীতকেই বাহন হিসেবে বেছে নিলেন; সেই সাথে তাঁর সতত প্রবহমান কবিমানসে বিপুল প্রভাববিস্তারী পদ্মা নদীর সদম্ভ আত্মপ্রকাশ; ভাষার সংহতি আয়ত্ত্ব, গীতিকবিতার গতি ও ভাষার সংহতির সমন্বয়ের চেষ্টা

খেয়া পর্ব

রবীন্দ্রপ্রতিভার বনবাস; সমন্বয় হলোই না, উল্টো ভাষার সংহতিও যেন হারিয়ে গেল

বলাকা পর্ব

‘কল্পনা’র ভাষা সংহতি গুণের চরম প্রকাশ, ‘ক্ষণিকা’ গীতিকবিতার চলমানতা বা গতির চরম প্রকাশ; আর এই দুইয়ের অসাধারণ সমন্বয় ঘটন ‘বলাকা’য়; ফলাফলস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ উপহার দিলেন বিচিত্র গতির চরণে গঠিত, প্রয়োজন ও ধর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন আকারের শ্লোকের সম্মিলনে এক নতুন ছন্দ- বলাকার ছন্দ

বিষয়বস্তুর দিক থেকেও বলাকা অনন্য। প্রমথনাথ বিশীর ভাষায়, ‘ইহা পূর্ববর্তী কাব্যের মত বস্তু-বিশ্বের জগৎ নয়; কাল-বিশ্বের জগৎ। এ জগতের প্রধান উপাদান কাল এবং তাহার ধর্মই চলিয়া-যাওয়া;’।

অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যে আবার মানবমুখিন হলেন বটে, কিন্তু তাঁর এ কাব্যের মানবমুখিনতা নতুনতর, অনন্য। এবং এই মানবমুখিনতার 'মানব'-ও রবীন্দ্র কবিমানসে নতুনতর; পূর্বে রবীন্দ্রনাথের মানবেরা ছিল কেবল ভারতবাসী, এখানে রবীন্দ্রনাথের মানবেরা বিশ্ববাসী।

বলাকা কাব্য পরিচিতি

বলাকা রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য। অধিকাংশ রবীন্দ্র-সমালোচকের মতেই, এটি কবির কবিমানসের পরিণত সময়ের সৃষ্টি; এবং জীবন ও অরূপের সমন্বয়ে এর কবিতাগুলোও অত্যন্ত পরিণত।

বলাকা কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৩২৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে, ইংরেজি ১৯১৬ সালে। কাব্যে মোট কবিতা আছে ৪৫টি। কবিতাগুলো দুই বছর ধরে লিখিত; প্রথম চৌত্রিশটি ১৩২১ বঙ্গাব্দে, শেষের ১১টি ১৩২২-এর কার্তিক থেকে পরের বৈশাখের মধ্যে লিখিত। অর্থাৎ, আলোচ্য কবিতাগুলির প্রথম পাঁচটি (১-৫) ১৩২১ বঙ্গাব্দে, এবং শেষ দু'টি (৩৭ ও ৪৫) ১৩২২-২৩ বঙ্গাব্দে রচিত।

কাব্যটির অধিকাংশ কবিতাই 'সবুজপত্র'-এ প্রকাশের জন্য রচিত হয়েছিল। আর কিছু কবিতা 'প্রবাসী', 'মানসী' ও 'ভারতী' সাহিত্যপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সাহিত্যপত্রিকা/ সাহিত্য সাময়িকীগুলোতে প্রকাশের সময় প্রায় সবগুলো কবিতারই শিরোনাম ছিল (৩ ও ৪১ সংখ্যক কবিতা ব্যতীত); কিন্তু গ্রন্থাকারে সংকলনের পরে সেগুলো পরিত্যাজ্য হয়। (তবে তৃতীয় মুদ্রণ পর্যন্ত প্রথম ৮টি কবিতায় শিরোনাম ব্যবহার করা হয়েছিল)।

অর্থাৎ, বলাকায় আলোচ্য কবিতাগুলোর শিরোনাম না থাকলেও, পত্রিকায় প্রকাশের সময় প্রায় সবগুলোরই শিরোনাম ছিল। আবার ৩ সংখ্যক কবিতাটি পত্রিকায় শিরোনামহীন প্রকাশিত হলেও, প্রথম তিনটি মুদ্রণে বলাকায় এর শিরোনাম ছিল। আলোচ্য কবিতাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিচে দেওয়া হল-

১ (সবুজের অভিযান)

রচনাকাল: ১৫ বৈশাখ, ১৩২১

রচনাস্থান: শান্তিনিকেতন

সাময়িকপত্রে প্রকাশ: সবুজপত্র

৪ (শঙ্খ)

রচনাকাল: ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১

রচনাস্থান: রামগড়

সাময়িকপত্রে প্রকাশ: সবুজপত্র

৫ (পাড়ি)

রচনাকাল: ৫ ভাদ্র, ১৩২১

রচনাস্থান: কলকাতা

সাময়িকপত্রে প্রকাশ: সবুজপত্র

৩৭ (ঝড়ের খেয়া)

রচনাকাল: ২৩ কার্তিক, ১৩২২

রচনাস্থান: কলকাতা

সাময়িকপত্রে প্রকাশ: প্রবাসী

৪৫ (নববর্ষের আশীর্বাদ)

রচনাকাল: ৯ বৈশাখ, ১৩২৩

রচনাস্থান: কলকাতা

সাময়িকপত্রে প্রকাশ: সবুজপত্র

বলাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য- গতিবাদ। রবীন্দ্রনাথের ‘গীতালি’ প্রকাশের পূর্বেই ফরাসি দার্শনিক বার্গসঁ-র বিখ্যাত গ্রন্থ Creative Evolution প্রকাশিত হয়। তবে বলাকার গতিবাদ অনেকটাই বার্গসঁ-র নিরর্থক গতিবাদের সম হলেও সম্পূর্ণ এক নয়। বার্গসঁ-র গতিবাদ সম্পূর্ণ নিরর্থক, তাতে কোন পরিণাম বা সার্থকতার স্থান নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলাকায় উদ্দাম বেগে নিরর্থক ধেয়ে চলার কথা বললেও, কয়েক জায়গায় পরিণামের প্রসঙ্গও এসেছে। প্রমথনাথ বিশীর মতে, বলাকায় রবীন্দ্রনাথের গতিবাদের স্বরূপ অনেকটা এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে- ‘অবিরাম গতি অবিচলিত বিরামের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়া সার্থকতা লাভ করিল’।

বলাকা কাব্য রচনার পেক্ষাপট ও প্রাসঙ্গিক কবিতাবলির সাথে প্রেক্ষাপটের সম্পর্ক

বলাকা কাব্যের যে কবিতাগুলো বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক, সেগুলোর ভিত্তিতে বর্তমান আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে, কাব্য-রচনার বা কাব্যের কবিতাগুলো রচনার প্রেক্ষাপট আলোচনা করা জরুরি। বিশেষ করে, কাব্যান্তর্ভুক্ত ৭টি কবিতার মধ্য দিয়ে কবি সমসাময়িক বৈশ্বিক সংকট ও সভ্যতার বিপর্যয়ে মানবমুক্তির গতিপথ নির্মাণের প্রয়াস পেয়েছেন বলে এই নিবন্ধের দাবি, তার স্বরূপ উদ্ঘাটন ও তার কাব্যিক রূপায়ণ ব্যাখ্যা করার জন্য এই প্রেক্ষাপট আলোচনা করা বিশেষভাবেই প্রয়োজনীয়।

কাব্যটি রচনা ও প্রকাশের পূর্বে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত জীবনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। প্রথমত, তিনি বেশ লম্বা সময় প্রবাস-বাস করেন; সতের মাসের সফরকে সফর বা ভ্রমণ না বলে প্রবাস-বাস বলাই মনে হয় সঙ্গত। ১৯১২ সালের ১৬ জুন তিনি বিলেত, মানে ইংল্যান্ডে যান। যাওয়ার আগেই তিনি গীতাঞ্জলি-পর্বের বেশ কিছু গান ও কবিতার ইংরেজি তর্জমার কাজ শুরু করেন। ইংল্যান্ডে তার সাথে ইয়েটস-সহ বেশ কিছু ইংরেজ কবি-সাহিত্যিকের পরিচয় হয়। সে পরিচয়ের সূত্র ধরেই রবীন্দ্র-কাব্যের সাথে তাদের পরিচয় হয়, এবং ইয়েটস-এর উৎসাহে তারই ভূমিকাসহ স্বয়ং কবিকৃত গীতাঞ্জলি-র ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হয় রাজা ও ডাকঘরের ইংরেজি অনুবাদও। মূলত, ইংরেজি গীতাঞ্জলি-র জন্যেই ইউরোপে-আমেরিকায় কবির নামডাক ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। পড়ে তিনি সে বছরেই সেখান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান।

পরের বছরটি শুধু কবি রবীন্দ্রনাথের জন্যেই নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের জন্যেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বছর। এ বছরেই, ইংরেজি ‘গীতাঞ্জলি’ (The Song Offerings) কাব্যের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। হয়তো এই ঘটনা-ই রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভাকে বনবাস থেকে ফিরে আসতে সাহায্য করেছিল। সতের বছরের প্রবাস-বাস শেষ করে ফিরে এলে সে বছরেরই ডিসেম্বরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-লিট প্রদান করে।

এই দীর্ঘ বিদেশ-ভ্রমণ বা প্রবাস-বাস রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন করে। প্রমথনাথ বিশী দেখিয়েছেন, ভ্রমণপিয়াসী কবির জীবনে কয়েকটি ভ্রমণ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছিল; ১৮৭৮-৮০ সালের বিলেত-বাস (সন্ধ্যাসংগীত ১৮৮২), ১৮৯০ সালের সংক্ষিপ্ত বিলেত সফর (সোনার তরী পর্ব), ১৯১২-১৩ সালের সতের মাস-দীর্ঘ ইংল্যান্ড ও আমেরিকা সফর (বলাকা পর্ব) এবং ১৯২৪-২৫ সালের দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণ (যাত্রাপথেই পূরবীর অধিকাংশ কবিতা রচনা)। দেখা যাচ্ছে, যেন চারটি ভ্রমণেরই অবধারিত ফলাফল হয়ে এসেছে কবির কবিমানসে নূতন বাঁকবদল; এবং প্রতিটি বাঁকবদলই নূতনাকাঙ্ক্ষী। সে হিসেবেও ১৯১২-১৩ সালের দীর্ঘ সফরটি অনন্য।

এই সফরটি অনন্য, কারণ এই সফরেই তিনি বিশ্বের সমগ্র মানবজীবনের দেখা পেলেন, সমগ্রভাবে দেখতে পেলেন; তাঁর মনে একটা বৈশ্বিক চেতনার জন্ম হল। পাশাপাশি নোবেল প্রাপ্তি তাঁকে রাতারাতি বাংলার কবি বা ভারতবর্ষের কবি থেকে বিশ্বের কবিতে পরিণত করে দিল।

রবীন্দ্রনাথের এই দীর্ঘ সফর ও নোবেল প্রাপ্তি তাঁর কবিমানসে কীরূপ প্রভাব ফেলেছিল তাঁর বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, 'মানবজীবনকে দেখা এবং সমগ্রভাবে দেখা কবির সাধনা। কিন্তু সেই সমগ্রতা যে কত বিরাট এবং দাবি যে কত প্রচণ্ড তাহা বুঝিতে কবির বাকি রহিল না। এবং সেই দাবি যে আবার তাঁহার কাছে, ইহাও বিস্ময়ের! ... ইতিপূর্বে গীতাঞ্জলির সময় পর্যন্ত প্রধানত আমাদের দেশের জীবনযাত্রা কবির কাব্যবস্তু ছিল। ইহার সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অতীত-ভবিষ্যৎ পরিমাপ করিয়া তিনি একটা ঐক্যবোধের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য জীবনপ্রবাহের প্রচণ্ড আঘাতে এই ক্ষুদ্র ক্ষীণপ্রাণ ঐক্যবোধ শিথিল হইয়া গিয়াছে। ... যে-মানবজীবনকে ভিত্তি করিয়া কবি সামঞ্জস্যের স্বর্গ গড়িয়াছিলেন, সে-মানবজীবন অসম্পূর্ণ ছিল। এবারে সম্পূর্ণ মানবজীবনের তিনি সাক্ষাৎ পাইলেন, কিন্তু তাহার উপর ভিত্তি করিয়া সামঞ্জস্যের তোরণ নির্মাণ তেমন সহজ নহে, সেই জন্য পূর্বের কাব্যের ন্যায়, ঐক্যবোধ ও সামঞ্জস্য বলাকার প্রধান রস নয়। এই দুঃখ-দৈন্য-দুর্দশার পরপারেও যে "নূতন ঊষার স্বর্ণদ্বার" আছে ইহা কবির বিশ্বাস। সে স্বর্ণদ্বার আজ না খুলুক, একদিন যে তাহা খুলিবেই, তাহাতেই তাঁহার পরম আশ্বাস।'

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনেই যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল, শুধু তাই নয়; বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে এবং বিশ্বের ইতিহাসে একটি করে মহাগুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায়, এবং কবি তাদের সাক্ষী হন। ১৯১৪ সালে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সবুজপত্র'; বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে সবুজপত্রের অবস্থান নতুন করে নির্ণয় করার বা বর্ণন করার প্রয়োজনীয়তা নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সবুজপত্রের অন্যতম প্রধান লেখক ছিলেন। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তার 'রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা'য় দেখিয়েছেন, প্রায়ই পত্রিকা রবীন্দ্র-কাব্যমানসের বাঁকবদলের সাক্ষী হয়েছে। অন্তত তিনটি পত্রিকার কথা এখানে উল্লেখ্য- 'সাধনা', 'বঙ্গদর্শন' এবং 'সবুজপত্র'।

একই সালে, ১৯১৪-তে, শুরু হয়ে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। সেই যুদ্ধ প্রভাব ফেলে তার কবিমানসেও। অনেকটা যেন সেই প্রভাব থেকেই উদ্দিষ্ট কবিতাবলির জন্ম। এই বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব যে একটা ভাঙচুরের আয়োজন চলছিল সমস্ত পৃথিবীজুড়ে, সেই আয়োজনটাও কবি প্রত্যক্ষ করে এসেছিলেন তাঁর সতের মাস-দীর্ঘ ইউরোপ-আমেরিকা সফরে; সে অর্থেও এই সফরটি অনন্য। তিনি দেখেছিলেন, কীভাবে একটি যুদ্ধ দানা বেঁধে উঠছে, একটি ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কীভাবে ফুঁসে উঠছে বিশ্ববাসী। পৃথিবীময় যে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলচিল, একটা ভাঙাচোরার আয়োজন চলছিল, তা-ই রবীন্দ্র কবিমানসে, হয়তো অবচেতনেই, প্রভাব ফেলে। বিশ্বভারতীর সাহিত্য ক্লাশে বলাকা পড়াতে গিয়ে তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন- '(বলাকার কবিতাগুলি রচনার সময়) আমার প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা চলছিল এবং সে সময়ে পৃথিবীময় একটা ভাঙাচোরার আয়োজন হচ্ছিল। ... এই কবিতাগুলি ধারাবাহিকভাবে একটার পর একটা আসছিল। হয়তো এদের পরস্পরের মধ্যে একটা অপ্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। এইজন্যই একে 'বলাকা' বলা হয়েছে। হংসশ্রেণীর মতনই তারা মানসলোক থেকে যাত্রা করে একটি অনির্বচনীয় ব্যাকুলতা নিয়ে কোথায় উড়ে যাচ্ছে।'

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বিশ্বযুদ্ধ আর সবুজপত্রের প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে ড. ক্ষুদিরাম বসু ‘রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়’-এ লিখেছেন, ‘বলাকার জীবনসংকেত-সমৃদ্ধ কবিতাগুলির বহিঃপ্রেরণারূপে দু’টি ঘটনার উল্লেখ অবশ্যই করতে হয়, একটি প্রথম মহাযুদ্ধ, অন্যটি ‘সবুজপত্রে’র প্রকাশ। এর মধ্যে প্রথমটিই গুরুতর, কারণ এতে কবি নবজীবনের বার্তা শুনেছিলেন। সবুজপত্র কবিকে পূর্ণ সংস্কারমুক্তি ও নূতনকে বরণের মুখে চালিত করেছিল।’

বৈশ্বিক সংকট ও সভ্যতার বিপর্যয়ে রবীন্দ্রনাথ নির্মিত মানবমুক্তির গতিপথের স্বরূপ ও তার কাব্যিক রূপায়ণ

বলাকা কাব্যে কবি মানবমুক্তির যে গতিপথের সন্ধান দিয়েছেন, এক কথায় বলতে গেলে সেটিকে অভিহিত করা যায় ‘নূতনের আবাহন’ বলে, কিংবা বলা যেতে পারে ‘অবিচলিত বিরামের লক্ষ্যে নূতনের পথে অবিরাম যাত্রা’; জীর্ণ-সংস্কারাচ্ছন্ন-অচল-বদ্ধ-পরম পাকা পুরনোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নূতনকে বরণ করে নেয়ার মধ্য দিয়েই মানবের মুক্তি সম্ভব। কিন্তু পুরনোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নূতনকে বরণ করে নেয়ার পথটি মোটেই সুগম নয়। এই পথে আপদ আছে, আঘাত আছে, রক্তপাত আছে, মৃত্যু আছে; কিন্তু অবশেষে পুরনোকে পরাজিত করে নূতনের বিজয়ের সম্ভাবনাও আছে। আপদ-আঘাত-রক্তপাত-মৃত্যু পেরিয়েই যুগে যুগে পুরনোকে হারিয়ে নূতন এসেছে; এমনি করেই নূতন আসে, এমনি করেই আবারো নূতন আসবে। এমনি করেই সকল বৈশ্বিক সংকট ও সভ্যতার বিপর্যয়ে মানবমুক্তি ঘটে থাকে।

[১ (সবুজের অভিযান)]

বলাকার ১ সংখ্যক কবিতাটি রচিত একান্তই সবুজপত্রের জন্য, সবুজপত্রের প্রথম সংখ্যার জন্য। আর সবুজপত্র যে রকম বাংলা সাহিত্যে এক নূতনতর ভাব ও ভাষা নিয়ে এসেছিল, সবুজপত্রের প্রথম সংখ্যায় ‘সবুজের অভিযান’ নামে প্রকাশিত কবিতাটিও যেন তেমনি। কবিতাটিতে কবি দুরন্ত নবীনদের ক্রমশ অশান্ত প্রচণ্ড প্রমত্ত প্রমুক্ত হয়ে অমর হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন। তাদেরকে পুরনো বদ্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন জীবনধারাকে ভেঙে গুড়িয়ে নতুন জীবনধারা নতুন মূল্যবোধ নতুন মূল্যায়নে বলিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছেন। একই সাথে মনে করিয়ে দিচ্ছেন পথের বাধা-বিঘ্নের কথাও। আর এই বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে নূতনকে প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই নবীনের এই অমরতা লাভ সম্ভব।

পরবর্তীতে কবি যখন কবিতাটির ব্যাখ্যা করেন, তিনি মূলত যৌবন ও প্রবীণতার দ্বন্দ্বেদ্বর বিষয়টিতে গুরুত্বারোপ করেন। প্রবীণতা বাধা-বিঘ্ন এড়িয়ে আপ্তবাক্য-শাস্ত্রবাক্য-বাঁধা বুলি মেনে নিরাপদ জীবন যাপন করতে চায়। অন্যদিকে যৌবনের ধর্মই হল নিয়ম না মানা, বিপদ মাথা পেতে নিয়ে সবকিছুকে প্রত্যক্ষ করা, অনুভব করা। ব্যাখ্যার শেষে উপসংহার টেনে তিনি বলেন, ‘যৌবনই বিশ্বের ধর্ম, জরাটা মিথ্যা। যৌবন জরাসন্ধের দূর্গ ভেঙে ফেলে জীবনের জয়ধ্বজা উড়ায়।’

এই নূতনকে বরণ করাতেই মানব ও মানবাত্মার মুক্তি, আর তা কালে কালে পুনরাবৃত্ত হয়। বহু সংগ্রামে লব্ধ নূতনও একসময় পুরোনো হয়ে যায়, তাতে আবাস গড়ে জীর্ণতা-বদ্ধ প্রথা, শেকড় প্রোথিত করে নানা সংস্কার। তখন সেই লব্ধ নূতনটিকেও বদলানোর প্রয়োজন পড়ে। আর তরুণেরা যখন সেই বদলানোর কাজে প্রবৃত্ত হয়, তখনই প্রবীণেরা, যারা এক সময় বহু সংগ্রামে সেই নূতনটিকে লাভ করেছিল, তারা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। কারণ, তাদের অধিকাংশই তখন প্রবীণ, আরেকবার বদলানোর সাহস তাদের আর হয় না। তারাই তখন অতীতমুখো হয়ে ওঠে, অতীতের প্রসঙ্গ তুলে তর্ক করে; কিন্তু তাতে কান দেয়া নবীনের কর্ম নয়, নবীনরা তখন সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে পুচ্ছ উচ্চে

তুলে নাচায়।

এই আপাত সমসাময়িকতাহীন কিন্তু সার্বজনীন আবেদনে অসাধারণ কবিতাটিই সাময়িক আবেদনে ভাস্বর হয়ে ওঠে, যখন বলাকায় অন্তর্ভূক্ত হয়। এই কবিতায় আকাঙ্ক্ষিত নূতন পরের কবিতায় (২) সর্বনেশে হয়ে উঠেছে, তার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে, প্রলয়ংকর বিশ্বযুদ্ধের রূপে আসছে নূতনের আহ্বান। আবার ৩ সংখ্যক কবিতাতে নবীনেরাই কলকলিয়ে কথা কয়ে উঠল; দৃপ্ত তেজে তারা বলে উঠল, আজ যারা জীর্ণতার পক্ষে, ভবিষ্যতে তারা কেবলই কাঁদবে।

আর যখনই কবিতাটির সাময়িক আবেদন পাওয়া যায়, তখনই আবিষ্কৃত হয়, কবিতাটিতে সাময়িক সংকটের কথাও আছে। কবিতাটি রচিত হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই; তখনো বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়নি ঠিকই, কিন্তু একটা ভাঙাচোরার আয়োজন দানা বেঁধে উঠছে। আর সেই দানা বেঁধে উঠতে থাকা অসন্তোষ, ভাঙাচোরার আয়োজন কবি ইংল্যান্ডে-আমেরিকায় গিয়ে প্রত্যক্ষ করে এসেছেন। তাই ভারতবাসীরা এখনো সেভাবে সচেতন হয়ে না উঠলেও কবি ভীষণই সচেতন; তিনি যেন ভারতবাসী নবীনদের সচেতন করে দিচ্ছেন-

বাহির-পানে তাকায় না যে কেউ

দেখে না যে বান ডেকেছে,

জোয়ার-জলে উঠছে প্রবল ঢেউ।

তবে এই নূতনের লক্ষ্য যে আসলে কী, এই পরিবর্তন মানুষকে কোনদিকে নিয়ে যাবে, কবি এখনো তা জানতে পারেননি; তা জানা খুব সহজও নয়। তবু কবি এই নূতনকেই বক্ষে তুলে নিতে চান, নূতনকে বরণ করতে আপদ-আঘাত বিনা দ্বিধায় মাথায় তুলে নিতে চান; আপদ-আঘাত উজিয়ে এগোতে চান নূতনের পথে, অজানার পথে, অনির্দিষ্টের পথে-

আন্ রে টেনে বাঁধা-পথের শেষে।

বিবাগী কর্ অবাধ-পানে,

পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।

পরিবর্তনের উদ্দেশ খুঁজে না পেলেও, কবি এই কবিতাতেই আশা করছেন, নূতনের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে; বার্গসঁ-র মতো কবি নিরন্তর গতিশীল থেকে নিরন্তর পরিবর্তনের কথা বলছেন না, তিনি পরিবর্তনের শেষে একটি নতুন প্রাপ্তিতে বিরামের আশা করছেন; আর তাই শেষ স্তবকে এসে তার কবিতার নবীন নিজের গলার বকুলের মালা পরিয়ে দেয় বসন্তের গলায়।

বসন্তেরে পরাস আকুল-করা

আপন গলার বকুলমাল্যগাছা।

এই বসন্ত নূতনের প্রতীক; বসন্ত এলে যেমন প্রকৃতিতে নূতনের মেলা বসে যায়, গাছগুলো নতুন পাতা আর নতুন কুঁড়িতে সেজে ওঠে, তাই দেখে পাখিরা দরাজ গলায় আনন্দের গান গাইতে শুরু করে দেয়, নবীনদের সবুজদের অভিযান শেষেও তেমনি মানবসমাজে বসন্ত আসবে; মানুষ নতুন সমাজবাস্তবতায় নতুন মূল্যবোধে নতুন করে বাঁচতে শিখবে, জীবনের নতুন মানে খুঁজে বের করে জীবনযাপন করবে, আর যে নবীনরা এই নবযুগ আনলো, তাদের জন্য প্রশংসা-গীত গীত হবে। এক্ষেত্রে আরেকটা তথ্য স্মর্তব্য, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রকৃতি মানুষের বিকল্প; ‘রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্য দিয়া মানবসত্তাকে জানিয়াছেন; প্রকৃতি-প্রীতির মধ্যে তিনি মানব-প্রীতির স্বাদ পাইয়াছেন।’১ আর তাই এই বসন্ত যে বিজয়ী

নতুন মানবসমাজের আকাঙ্ক্ষাজাত বা রূপক বসন্ত নয়, তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল।

[৪ (শঙ্খ)]

৪ সংখ্যক কবিতাটিও ১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রচিত। অর্থাৎ, এ কবিতাটিও বিশ্বযুদ্ধ শুরুর দু'মাস আগে রচিত। কিন্তু কবিতাটির শঙ্খটি, যেটি ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে থেকে, না বেজেই সবাইকে আহ্বান করছে, সেই শঙ্খ যেন বিশ্বযুদ্ধেরই শঙ্খ; শঙ্খটি যেন নিরবে নবীনদের যুদ্ধে যোগ দিয়ে নূতনকে জয়ী করারই আহ্বান জানাচ্ছে। ঝড়ের পূর্বে যেমন এক অস্বাভাবিক সাম্যাবস্থার সৃষ্টি হয়, যুদ্ধের পূর্বেও তেমনি এক গুমোট ভাব ঝুলে থাকে মানুষের পরিবেশে। সেই পরিবেশেরই যেন ইঙ্গিত মিলে প্রথম শ্লোকেই-

বাতাস আলো গেল মরে

একি রে দুর্দৈব!

কিংবা এই চিত্র পুরোনোর জীর্ণতা-বদ্ধতার রূপকও হতে পারে। আর তাই শঙ্খ নবীনদের আহ্বান জানাচ্ছে এই ঝুলে থাকা গুমোট ভাব গুড়িয়ে দিয়ে, কিংবা পুরোনোর জীর্ণতা-বদ্ধতা গুড়িয়ে দিতে প্রলয়ংকর যুদ্ধে মেতে উঠতে-

লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে,

গান আছে যার ওঠ্-না গেয়ে,

চলবি যারা চল্ রে ধেয়ে,

আয়-না রে নিঃশঙ্ক।

তবে এই প্রলয়ংকর যুদ্ধ, এই রক্তপাত কবির কিংবা মানবের আকাঙ্ক্ষিত নয়; কবি মূলত নিরন্তর পরিবর্তনের তথা বার্গসঁর গতিবাদে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী নন; তাঁর গতিবাদটি একটু ভিন্ন। তিনি বরং গতিশীল পরিবর্তনের মাধ্যমে অবিচলিত বিরাম-প্রত্যাশী, শুভ্রকান্তি-শান্তির রজনীগন্ধার প্রত্যাশী; তবে সেই বিরাম স্থিতির জড়তায় আড়ষ্ট নয়, বরং নূতনের আবাহনে সাড়া দিয়ে গতিশীলই থাকতে চায়। কিন্তু সমসাময়িক পরিস্থিতি, কিংবা অতীত হতে প্রাপ্ত শিক্ষা সেই শুচি পরিবর্তনের পক্ষে কোনো ইঙ্গিত দেয় না, ওরা রক্তজবার মতো রক্তিম উপায়ে পরিবর্তনেরই সাক্ষ্য দেয়। আর তাই কবি যখন ফুলের সাজি সাজিয়ে পূজার ঘরে অর্ঘ্য দিতে যান, তার সাজিতে স্থান দিতে হয় রক্তজবার রক্তিম মালার। আর তাই কবি এবার রণসজ্জায় সেজে মহোল্লাসে মহাশঙ্খ বাজানোর পক্ষপাতী; যুদ্ধ হোক শুরু।

কবিতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবি বলেন- 'এই কবিতা যে সময়কার লেখা তখনো যুদ্ধ শুরু হতে দু'মাস বাকি আছে। তারপর শঙ্খ বেজে উঠেছে; ঔদ্ধত্যে হউক, ভয়ে হউক নির্ভয়ে হউক, তাকে বাজানো হয়েছে। যে যুদ্ধ (শুরু) হয়ে গেল তা নূতন যুগে পৌঁছবার সিংহদ্বারস্বরূপ। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে একটি সার্বজাগতিক যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার হুকুম এসেছে। ... পাশ্চাত্য দেশে দেখে এসেছি সেই ঘরছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছে; তারা এক ভাবীকালকে মানসলোকে দেখতে পাচ্ছে, যে কাল সর্বজাতির লোকের। ... এই দলের কত অখ্যাত লোক অজ্ঞাত পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বলছে প্রভাত হতে আর বিলম্ব নেই। পাখির দল যেমন অরুণোদয়ের আভাস পায় এরা তেমনি নূতন যুগকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেছে।

'... আমাদের এই যুগ সমস্ত মানবের পক্ষে এক মহাযুগ, পৃথিবীতে এমন সন্ধিক্ষণ আর কখনো আসেনি।

একটা ভাবীকাল আসছে যা মানুষকে আগে থাকতে ভিতরে ভিতরে ঘা দিচ্ছে। মন্থনে যেমন নবনী ভেসে ওঠে তেমনি বিশ্বের বিধাতার জগৎব্যাপী মন্থন-ব্যাপারে সাধকেরা উঠে পড়েছেন। এই বিবাগির দলের বেরিয়ে পড়ার প্রয়োজন ছিল। বিধাতা এমনি করে ঠেলা মেরে এঁদের বার করে দেন, এঁরা সংকীর্ণ পরিবেষ্টন থেকে সরে গিয়ে মুক্তিলাভ করেন।'

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই আলোচনায় যুগসন্ধিক্ষণ বা সন্ধিক্ষণ শব্দটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ; আর তাই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাতেই শব্দটি বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বের সময়টি (সেই সাথে বিশ্বযুদ্ধের ও বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরের সময়টিও) ছিল মানবসভ্যতার এক সন্ধিক্ষণ; মানবসভ্যতায় তখন এক ভীষণ ভাঙচুরের আয়োজন চলছে, পুরনোকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে নূতনকে বরণ করার প্রস্তুতি চলছে জোরেশোরে। আর এই পরিবর্তনের 'সিংহদ্বার'রূপেই এসেছিল বিশ্বযুদ্ধ। পুরনোকে হারিয়ে দেয়ার জন্য এর চেয়ে মোক্ষম অস্ত্র বুঝি আর হয় না। তাই কবি ধুলোয় লুটিয়ে থাকা শঙ্খের নিরব আহ্বানের মাধ্যমে মহাযুদ্ধের সার্বজাগতিক যজ্ঞে অংশগ্রহণের জন্যে নবীনদের আহ্বান জানান।

এই যুদ্ধকে আশ্রয় করেই মানবমুক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষিত নূতনকে বরণের স্বপ্নজাল বুনছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এমনকি তিনি তাঁর 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধে আশা প্রকাশ করেছিলেন, এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি পারস্পরিক আঘাতে বিচূর্ণ হবে। পরবর্তীতে সাম্রাজ্যবাদের পতনও ঘটে, নূতন জীবনধারা হিসেবে গণতন্ত্র পৃথিবীজুড়ে আদৃত হতে শুরু করে; তবে ধনতন্ত্রের পতন ঘটেনি, বরং গণতন্ত্রের সাহচর্যে আরো পোক্ত হয়েছে।

[৫ (পাড়ি)]

৫ সংখ্যক কবিতাটি বিশ্বযুদ্ধ শুরুর প্রথম সপ্তাহেই রচিত। আগের কবিতাগুলো রচনার সময় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়নি, নতুন যুগের সিংহদ্বার তখনো উন্মুক্ত হয়নি, কবি তাই ওগুলোতে সেই সিংহদ্বারের উন্মুক্তির প্রতীক্ষা করছিলেন। এবার সিংহদ্বার খুলে গেল, কবিও তাই ভাবনার নতুন খোরাক পেলেন; এবার কবির ভাবনা- সেই সিংহদ্বার বেয়ে কী মানিক রতন আসবে, কার কাছে আসবে; এতোদিন কবি নূতনকে আহ্বান করছিলেন, এবার কবি সেই নূতনকে নিয়েই ভাবতে শুরু করলেন।

এই কবিতার শুরুতেও কবি বিশ্বযুদ্ধের ইঙ্গিত দিয়েছেন; তা নিতান্তই স্বাভাবিক। কবি নিজেই বলেছেন, বলাকার কবিতাগুলো বলাকার তথা হংসশ্রেণীর মতনই একটার পর একটা মানসলোক থেকে নিরুদ্দেশের পানে যাত্রা করছিল। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে কবির কাছে যুদ্ধটি নূতনের আবাহনী প্রলয়ংকরী ঝড়ের রূপ পেল-

ঝড় বয়েছে, ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে

আসছে তরী বেয়ে।

কালো রাতের কালি-ঢালা ভয়ের বিষম বিষে

আকাশ যেন মূর্ছি পড়ে সাগর-সাথে মিশে;

উতল ঢেউয়ের দল খেপেছে, না পায় তারা দিশে-

তারপর কবির আকাঙ্ক্ষিক্ষত এই নেয়ে সকলকেই চমকে দেয় তার তরীতে সাদা পাল উড়িয়ে। স্পষ্টতই কবি বুঝিয়ে দিয়েছেন, এই নেয়ে বিজয়ী, এই তরী বিজয়ীর তরী; এ বিজয় নূতনের, কবির আকাঙ্ক্ষিত 'পক্ষের'। আর এই সাদা পাল শান্তির সাদা পাল, কিংবা কবির আকাঙ্ক্ষিত অবিচলিত বিরামের সাদা

পাল।

কবিতাটিতে কবি দু'টি প্রশ্ন করেছেন নিজেই, নিজেই সে প্রশ্ন দু'টির উত্তরও দিয়েছেন; 'নাবিক যে সম্পদ নিয়ে আসছেন তা কী এবং নাবিক কোন ঘাটে উত্তীর্ণ হবেন? যুদ্ধের সাগর যিনি পার হয়ে আসছেন তিনি কোন্ দেশে কার হাতে তাঁর সম্পদকে দান করবেন?'

প্রথম প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত সংক্ষেপে দিয়েছেন কবি-

নহে নহে, নাইকো মানিক, নাই রতনের ভার

একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনীগন্ধার,

এই রজনীগন্ধার হার শান্তির প্রতীক নয়, অবিচলিত বিরামের প্রতীক। পূর্বের কবিতাতেই (৪, শঙ্খ) কবি 'রজনীগন্ধা'কে ব্যবহার করেছিলেন, সেখানেও অবিচলিত বিরামের প্রতীক হিসেবেই। কবি যখন অবিচলিত বিরামের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন ধুলোয় লুটানো মহাকালের শঙ্খ দেখে তার উপলব্ধি হয়, অবিচলিত বিরামের সময় এখনো আসেনি, বরং নূতনের ডাক এসেছে; সেই নূতনকে বরণ না করে অবিচলিত বিরাম সম্ভব নয়। তাই তার সাজিতে স্থান পেয়েছিল রক্তজবা। এবার যখন নূতনকে বরণ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে, যে মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে পৃথিবীব্যাপী একটা ভীষণ ভাঙচুরের আয়োজন চলছিল, সেই ভাঙচুর-বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, এবার কবি অবিচলিত বিরামের প্রত্যাশা করতে শুরু করলেন।

এই অবিচলিত বিরাম ক্ষমতালিপ্সুদের জন্য নয়, লোভী ধনীদের জন্য নয়; সাধারণ মানুষের জন্য, নিভৃতাচারীদের জন্য; তাদের-

রুক্ষ অলক উড়ে পড়ে, সিক্তপলক আঁখি,

ভাঙা ভিতের ফাঁক দিয়ে তার বাতাস চলে হাঁকি,

দীপের আলো বাদল-বায়ে কাঁপছে থাকি থাকি

ছায়াতে ঘর ছেয়ে।

কেউ যার নাম জানে না, খোঁজ রাখে না, এই নূতন তারই ঘরে পৌঁছে দেবে তার রজনীগন্ধার গোছা, কবির আকাঙ্ক্ষিত অবিচলিত বিরাম।

কিন্তু এই অবিচলিত বিরামের আসার পথটি সহজ নয়, সুগম নয়; সর্বোপরি এ যাত্রা, এ যুদ্ধ স্বল্পস্থায়ী নয়।

অনেক দেরি হয়ে গেছে, বাহির হল কবে

উন্মনা মোর নেয়ে।

এখনো রাত হয়নি প্রভাত, অনেক দেরি হবে

আসতে তরী বেয়ে।

সে আগমনও খুব জাঁকজমকপূর্ণ হবে না। ক্ষমতালিপ্সু আর ধনীরা যখন যুদ্ধের ফলাফল থেকে তাদের স্বার্থ কতোটা উদ্ধার হল, আর কতোটা স্বার্থোদ্ধার সম্ভব, সেই হিসেবে মশগুল থাকবে, তখন সবার অগোচরে অলক্ষ্যে নিরবে নিভৃতে পথের পাশের জীর্ণ ঘরের জীর্ণ ঘাটে রজনীগন্ধার গোছা নায়ে নিয়ে ভিড়বে উন্মনা নেয়ে; সে ঘরের প্রাচীন বদ্ধতা-অন্ধকার কেটে যাবে, আলোয় ঘর ভরে উঠবে, নূতনের

আবাহনী সংগীতে পুলকে-পরশে সে গৃহবাসীর দেহ ভরে উঠবে।

প্রচণ্ড গতির ভীষণ আঘাতে পুরোনো ভেঙে পড়লে নূতনের অবিচলিত বিরাম প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনি করে পুরোনোকে নূতন দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে অবিচলিত বিরাম প্রতিষ্ঠার জন্য যে অবিরাম গতি, তা-ই রবীন্দ্রনাথ নির্মিত মানবমুক্তির গতিপথ।

[৩৭ (ঝড়ের খেয়া)]

৩৭ সংখ্যক কবিতাটি ৫ সংখ্যক কবিতার প্রায় ১৫ মাস পরে লিখিত, এবং আলোচনার অন্তর্ভূক্ত কবিতাগুলোর মধ্যে একমাত্র এই কবিতাটি-ই সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়নি, প্রকাশিত হয় প্রবাসীতে; তখনো বিশ্বযুদ্ধ চলছে, ভীষণভাবেই চলছে। কবিতার শুরুতে সেই যুদ্ধেরই বর্ণনা এসেছে, পূর্বে আলোচিত কবিতাগুলোর মতোই;

দূর হতে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,

ওরে উদাসীন-

ওই ক্রন্দনের কলরোল,

লক্ষ লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।

বহ্নিবন্যা-তরঙ্গের বেগ,

বিষ-শ্বাস ঝটিকার মেঘ,

ভূতল-গগন

মূর্ছিত বিহ্বল-করা মরণে মরণ আলিঙ্গন;

তবু এই প্রলয়ংকর যুদ্ধের মাঝেই নূতনের পথে যাত্রা করতে হবে; ‘পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা/ আর চলিবে না।’ সেই পুরনোর বুকে সত্যের পুঁজি ফুরিয়ে আসছে, বঞ্চনা বাড়ছে দিনদিন; সে জীবনধারা-বিশ্বাস-মূল্যবোধ অচল হয়ে পড়েছে; নূতন জীবনবোধের উদ্বোধন প্রয়োজন।

পূর্বে কবি বিশ্বযুদ্ধকে ‘সিংহদ্বার’ বলে অভিহিত করেছিলেন। এবার বলছেন, সেই সিংহদ্বারের মধ্য দিয়ে ‘নূতন ঊষার স্বর্ণদ্বার’ খুলবে; কিন্তু সেই স্বর্ণদ্বার খুলতে আর কতো দেরি? সেই স্বর্ণদ্বার খুলতে নূতনের অভিযাত্রীরা ঝড়-ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ পথে যাত্রা শুরু করে; মা আর প্রেয়সীর ক্রন্দন পিছে রেখে, ঝড়ের গর্জনে বিচ্ছেদের হাহাকার বিলিয়ে দিয়ে, তারা তরী নিয়ে মৃত্যু ভেদ করে পাড়ি দেয় নূতন সমুদ্রতীরের অভিমুখে।

কিন্তু কোথায় সে নূতন সমুদ্রতীর? কোন পানে তরীর গন্তব্য? কবি এখনো তা জানে না; কবি এখনো জানে না এ নূতনের স্বরূপ কী; শুধু জানে, পুরোনো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে বেচাকেনা আর চলবে না, ‘বন্দরের কাল হয়েছে শেষ’, এখন নূতন সঞ্চয় প্রয়োজন। নূতনের ডাক এসেছে, তাকে বরণ করে নিতে হবে।

কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে, কবে হবে পার,

সময় তো নাই শুধাবার।

এই শুধু জানিয়াছে সার

তরঙ্গের সাথে লড়ি

বাহিয়া চলিতে হবে তরী।

টানিয়া রাখিতে হবে পাল,

আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল;

বাঁচি আর মরি

বাহিয়া চলিতে হবে তরী।

নূতনের অজানা সমুদ্রতীরে, অজানা দেশে পৌঁছানোর জন্য কণ্ঠে কণ্ঠে ঝড়ের মতো প্রচণ্ড আহ্বান। নবজীবনের অভিসারে সকলে জীবন বাজি রাখছে। মৃত্যুর থাবা উপেক্ষা করে নবীন অভিযাত্রীরা নূতনের পথে যাত্রা করছে।

এ যেন পাপের প্রায়শ্চিত্ত; বহু যুগ ধরে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বহুযুগ-সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে নূতন পথের বীর অভিযাত্রীগণ। সে পাপ কার, কাদের, সে প্রশ্ন করে লাভ নেই; 'বিশ্বে যদি কোথাও একটু পাপ অন্যায় অসত্য প্রবল হইয়া উঠে তাহার জন্য বিশ্ববাসী সকল নরনারী দায়ী, এবং তাহার ফলভাগীও হইতে হয় সকলকে।'৩ কবি নিজেও বলেছেন- 'অনেক দিন থেকে আপনার মধ্যে আপনাকে যে মানুষ কঠিন করে রুদ্ধ করেছে, আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করে তুলেছে, তার সেই অবরুদ্ধতা আপনাকেই আপনি একদিন বিদীর্ণ করবেই করবে। ... এ যে সমস্ত মানুষের পাপ পুঞ্জীভূত আকার ধারণ করেছে। সেই পাপই যে মারবে এবং মেরে আপনার পরিচয় দেবে।

'মানুষের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই, সমস্ত মানুষ এক। ... মানুষের সমাজে একজনের পাপের ফলভোগ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়; কারণ, অতীতে ভবিষ্যতে, দূরে দূরান্তে, হৃদয়ে হৃদয়ে, মানুষ যে পরস্পর গাঁথা হয়ে আছে।' কবি কবিতাতেই বলছেন-

এ আমার এ তোমার পাপ।

বিধাতার বক্ষে এই তাপ

বহু যুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়-

'যে পাপের ভার এতদিন নানা স্থানে নানা জনে জমাইয়া তুলিতেছিল, তাহারই আঘাতে রুদ্র আজ জাগ্রত হইয়াছেন- দেবতার ও মানবতার অপমান তিনি সহ্য করিতে পারিতেছেন না।'৪ রুদ্রের রোষেই আজ এত মৃত্যু, এত ঝড়-ঝঞ্ঝা; এই মৃত্যু মানবেরই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। তাই নূতন বন্দরে নোঙর করতে হলে সে মৃত্যুকেও বরণ করতে হবে; সে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে অকম্পিত বুকে বলতে হবে-

তোরে নাহি করি ভয়,

এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।

তোর চেয়ে আমি সত্য, এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ্।

শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।

‘এই মৃত্যুর অন্তরে প্রবেশ করিয়া অমৃত আহরণ করিতে হইবে, এই মিথ্যার বাধা ভেদ করিয়া সত্যকে আবিষ্কার করিতে হইবে, এই পাপের পঙ্কে নামিয়া পূণ্যপঙ্কজ উদ্ধার করিতে হইবে। এই যে কত দেশের কত বীরহৃদয় শোণিত দিয়া পাপ অন্যায় ক্ষালন করিতে চাহিতেছে, এই যে কত মাতার ও স্ত্রীর অশ্রু ঝরিতেছে, ইহাতে কি পাপ দূর হইয়া পৃথিবীতে নূতন স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে না? এই যে এত দুঃখ ও আত্মবলিদান, ইহার জন্য তো বিশ্বেশ্বর বিশ্ববাসীর নিকট ঋণী হইতেছেন, তাঁহাকে তো পুণ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া এই ঋণ শোধ করিতে হইবে। ... মানুষ যখন মৃত্যুকে বরণ করিয়া মানবতার ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে উঠিতেছে তখন তো সেই মানবতার মধ্যে দেবত্বের অমর মহিমা বাধ্য হইয়া ফুটিয়া উঠিবে, সে বিষয়ে কোনো সংশয় কবির মনে নাই।’৫

এমনি আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বহুযুগের সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হলে নবযুগ আসতে বাধ্য; পুরোনো জড়কে বিদীর্ণ করে নূতনের উত্থান ঘটবেই- এ কবির দৃঢ়প্রত্যয়।

এই পুরোনো জড় জীবনবোধ-জীবনধারা প্রসঙ্গে ড. ক্ষুদিরাম সেন উল্লেখ করেছে ‘ইয়োরোপ-পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী ও আমাদের পক্ষে সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থে’র কথা। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র দু’টোই পুরোনো জীবনদর্শন, বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই গোপনে গোপনে বিশ্বজুড়ে এদের বিরুদ্ধে একটা সামগ্রিক ক্ষোভ ঘনিয়ে উঠছিল, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে; আনন্দের বিষয়, বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে দু’টোরই বিনাশ ঘটে। কিন্তু এদের বিনাশের ফলে কী আসতে যাচ্ছে, তা পূর্ব-নির্ধারিত ছিল না। বিশ্বযুদ্ধের ফলে পৃথিবীতে গণতন্ত্র আর পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নূতন সর্বতোভাবে ভালো হলো কিনা, সে ভবিষ্যদ্বাণী কবি করে যাননি; প্রকৃতপক্ষে, তিনি নূতনের কোন স্বরূপের কথাই বলেননি, কেবল বলেছিলেন, জীর্ণ পুরাতনকে ঝেড়ে ফেলে নূতনকে গ্রহণ করতে হবে। কবিতাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ড. ক্ষুদিরাম সেনও এই কথাই বলেন- ‘সংগ্রামী মানুষের পক্ষে এরকম যাত্রা প্রকৃতপক্ষে অজানার দিকে, তা ফলাফলবিচারশূন্য, কারণ, সমাগত বিশ্বযুদ্ধে কী হবে তা পূর্বাহ্নে কেউই বলতে পারছে না। তা না পারুক, এই যুদ্ধে ইতিহাস-বিধাতা যে-নূতন ইতিবৃত্তের সূচনা করছেন, মানুষকে তা অনিবার্যভাবে গ্রহণ করতেই হবে।’

[৪৫ (নববর্ষের আশীর্বাদ)]

ঝড়ের খেয়া রচনারও প্রায় মাস ছয়েক পরে কবি নববর্ষের আশীর্বাদ (৪৫ সংখ্যক কবিতা) রচনা করেন; এই নামেই কবিতাটি সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়। এটি আলোচনার শেষ কবিতা তো বটেই, বলাকারও শেষ কবিতা। এবং আলোচনার অন্যান্য কবিতার তুলনায় এই কবিতাটি কিছুটা দুর্বলও বটে।

কবিতাটিতে সরাসরি যুদ্ধের উল্লেখ নেই; যুদ্ধের উল্লেখ না থাকলেও নূতন পথের যাত্রীদের পথচলার বাধা-বিঘ্নের কথা এসেছে; কবি নূতন পথের যাত্রীকে কণ্টকের অভ্যর্থনা, গুপ্তসর্পের গুঢ়ফণা, কালবৈশাখীর আশীর্বাদ, শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। কবিতা পাঠে মনে হয়, কবি এ কবিতায় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে নূতন পথের অভিযাত্রীদের নূতন পথে চলা অব্যহত রাখার পন্থাই বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে প্রথম দু’ চরণ-দৃষ্টে তেমনি বোধ হওয়াটাই স্বাভাবিক, যখন সেখানে কবি পুরাতন বছরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি কেটে যাওয়ার কথা বলেছেন-

পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি

ওই কেটে গেল ওরে যাত্রী!

তারপরের চরণেই আবার নূতনের আবাহন চলে আসার ইঙ্গিতও দিয়েছেন তিনি-

তোমার পথের ’পরে তপ্ত রৌদ্র এনেছে আহ্বান

রুদ্রের ভৈরব গান।

কিন্তু নূতনের আহ্বান এসে গেলেও নূতন পথের যাত্রীর পথচলার এখানেই শেষ নয়, বরং বলা যায় শুরু। সবুজের অভিযান আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'যৌবন জরাসন্ধের দূর্গ ভেঙে ফেলে জীবনের জয়ধ্বজা উড়ায়।' জীবনের এই ধ্বজা উড্ডীন রাখতে যৌবনকে সদা সর্বদা নূতনের পথে যাত্রা অব্যাহত রাখতে হয়। সে যাত্রাপথে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে, নূতনের পথে যাত্রায় এগুলিই প্রাপ্তি, আশীর্বাদ।

ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার।

চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার

সে তো নহে সুখ ওরে, সে নহে বিশ্রাম,

নহে শান্তি, নহে সে আরাম।

মৃত্যু তোরে দিবে হানা,

দ্বারে দ্বারে পাবি মানা

এই তোর নব বৎসরের আশীর্বাদ,

এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

কবিতার শেষ শ্লোকে গিয়ে কবি নিশ্চিতভাবেই ঘোষণা করছেন, নূতন এসেছে; যেমনিভাবে যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই তিনি যুদ্ধের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, অনেকটা তেমনিভাবেই যুদ্ধ শেষের আগেই নূতনের আগমনী বার্তা দিয়ে দিলেন। নূতনের নিশ্চিত আগমনী বার্তা পেলেও তিনি এখনো সেই নূতনের স্বরূপটি ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি; তাই নূতনের পথে যাত্রা এখনো শেষ হয়নি। যতোক্ষণ না পর্যন্ত নূতনকে চেনা যাচ্ছে, নূতনের প্রতি নির্ভর করা যাচ্ছে, নূতনে নির্ভর করে অবিচলিত বিরাম নেয়া যাচ্ছে, ততোদিন পর্যন্ত এই নূতনের পথে যাত্রা অবিশ্রান্তভাবে চলতে থাকবে। এমনিভাবে অবিচলিত বিরামের উদ্দেশ্যে নূতনের পথে অবিশ্রান্ত যাত্রাই রবীন্দ্রনাথ প্রদর্শিত মানবমুক্তির গতিপথ।

সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথ নির্মিত বৈশ্বিক সংকট ও সভ্যতার বিপর্যয়ে মানবমুক্তির গতিপথ

সর্বোপরি, সম্পূর্ণ আলোচনায় বৈশ্বিক সংকট ও সভ্যতার বিপর্যয়ে রবীন্দ্রনাথ নির্মিত মানবমুক্তির যে গতিপথের স্বরূপ ও কাব্যিক রূপায়ণ বিশ্লেষিত হল, সংক্ষেপে তাকে এভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে- মানবসভ্যতা সর্বদা নূতন পথে যাত্রা অব্যাহত রাখতে চায়, অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত অবিচলিত বিরামের উপযোগী কোনো পথ না পাওয়া যাচ্ছে। ব্যাপারটিকে এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে- অবিরাম গতির মাধ্যমে অবিচলিত বিরামের লক্ষ্যে যাত্রা। এমনিভাবে নূতনের পথে অবিরাম যাত্রার মাধ্যমেই বৈশ্বিক সংকট ও সভ্যতার বিপর্যয় মোকাবেলা করা সম্ভব, যেমনিভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী সমাজব্যবস্থা ভেঙে তৎকালীন বৈশ্বিক সংকট ও সভ্যতার বিপর্যয়ের মোকাবেলা করা হয়েছিল।

যে বই থেকে উদ্ধৃতিগুলো নেয়া হয়েছে

১রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ, প্রমথনাথ বিশী

২রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়, ড. ক্ষুদিরাম দাস

৩, ৪, ৫রবি-রশ্মি, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১১), বলাকা, বিশ্বসাহিত্য ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (), বলাকা, , কলকাতা

৩. প্রমথনাথ বিশী (মাঘ, ১৪০৪), রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা

৪. অধ্যাপক ড. ক্ষুদিরাম দাস (১৯৯৬), রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা

৫. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (বৈশাখ ১৪০৩), রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা

৬. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (), রবি-রশ্মি, এ মুখার্জী, কলকাতা